ম হা কা শ ম হা কা ল

মাসউদ আহমাদ

স্বরবর্ণ

মহাকাশ মহাকাল
মাসউদ আহমাদ

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২১ খ্রি.

প্রকাশক
স্বরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : info.shoroborno@gmail.com

পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
quickkcart.com

প্রচ্ছদ
আখতারুজ্জামান

মুদ্রণ
শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

মূল্য
৩০০টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Mohakash Mohakal By Masud Ahmad, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 300, ISBN : 978-984-8012-68-0

উৎসর্গ...

আমার আত্মার প্রশান্তি প্রিয় মমতাময়ী মা এবং আব্বাকে—এই শান্ত জীবন, জীবনের পৃথিবীকে জানার প্রবল আগ্রহ, লেখার প্রতিভাটুকু, আমার স্বপ্ন, সাহস, দ্বীনি অনুভূতি তাদের উপহার।

মানিকগঞ্জী হুজুরকে—ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের সুন্দর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনা হুজুরের কাছে পেয়েছি।

আমার নানিকে ও নানাকে—ইসলামের জন্য অবিচলতার অনুপ্রেরণা তাদের কাছে পাওয়া। খালাকে, ছোট মামা ও বড় মামাকে—তাদের ভালোবাসা যেমন আমাকে ভালোলাগায় পূর্ণ করেছে, আমাকে অনেক আনন্দিত করেছে, কখনো কাঁদিয়েছেও, জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে শিখেছি তাদের কাছে।

আমার চাচা হাসান আলীকে—অন্যের প্রতি সহনশীলতার, বুকে গভীর বেদনা রেখেও ভালোবাসার কথা বলার শিক্ষা পেয়েছি তার কাছে।

আমার সহযাত্রী—

ইলিয়াস বিন মাজহার ভাইকে—যার জীবনের উত্থান-পতনের জন্য আমি দায়ী।

জাহিদ হাসান রিফাত ভাইকে—সবসময় প্রাতিষ্ঠানিক পড়া আর পরীক্ষার চিন্তা নিয়ে থেকেও যে আমাদের কাজের কথা নিয়মিত ভেবেছে।

মানজুর আশরাফি ভাইকে—ইলিয়াস ভাই ও আমার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রাখার জন্য।

আবদুল আওয়ালকে—যাকে নিজেদের করে পাওয়ার জন্য কত করে চেয়েছি, তবু সাড়া দেয়নি। শেষে আমাদের মধ্যে অবস্থানগত দূরত্ব সৃষ্টি হলো আর তার মন বসল লেখালেখিতে।

আনোয়ারুল ইসলামকে—আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও যে আমাদের কাজের জন্য বেশি আর্থিক সাহায্য করেছে।

আমার শুভাকাঙ্ক্ষী—

ফাহাদ আবদুল্লাহ ভাইকে—তার ও তার আঙিনার জন্য।

আর বিশেষভাবে তাদেরকে—যারা কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হীনম্মন্যতায় ভোগেন না; যারা না শাসক, না বিজ্ঞানকে তোয়াক্কা করেন।

লেখকের ভূমিকা
ও মাহদির চিঠি

প্রিয় মাহদি, তুমি জানো, সব পিছুটান ছেড়ে অজানার সফরে বেরোনোর কত স্বাদ! ঘাড়ের ওপর কোনো দায়িত্বের বোঝা নেই। কোনো ব্যর্থতার ভাবনা নেই। শুধু সময় অজানাকে জানার। পৃথিবীটাকে চেনার।

আমাদের এই জীবন বড় আবদ্ধতার। আমাদের চারপাশে কতকিছুতে গড়া কত দেয়াল! সে দেয়াল না পারি ভাঙতে না ভাঙতে চাই না ডিঙোতে। আমরা পৃথিবীতে আসি আবার পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাই পৃথিবীকে পুরোপুরি তো দূর এক আধুলিও না জেনে।

জানি, বুঝি সব। কী আসে যায়! কিছু না। আমাদের উদ্যোগ নেই এই জীবনকে সঠিকভাবে অর্থবহ করার বরং আমাদের কোনো সিদ্ধান্তই নেই। জীবনের এই অতি সরলতাও জীবনের জন্য ক্ষতির। তাতে কী হলো! ব্যাস, আমাদের ভাবনা।

দা অ্যালকেমিস্ট সান্তিয়াগোর জীবনকে আমাদের দেখিয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছনোর ঠিক অদম্য স্পৃহাটা তারই ছিল। আমাদের না, কখনো না। আমরা বুঝি, আমরা মানি এসব কথা, তার মতো পারি না শুধু। পারি না, কেন পারি না আমরা! আমরা এত ডরপোক! হা!

ভাবি, আমি আজ সব ছেড়েছি। আমার ভেতর কী ভালোলাগা কাজ করছে! এ কেউ বোঝেনি, বেশ ভালো। তাই কেউ আমার সাথি হতে চায়নি। আমি একাকী চলেছি, একাকী এসেছি এতদূর, একাকীই চলতে থাকব এ জীবন। আজ পাখিদের এক প্রেয়ারি প্রান্তরে জীবনের শেষ দিনটি শেষ হয়ে গেলেও আমি তৃপ্তিবোধ করব। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি খুশি। আমার ডায়েরিটা কোনো পথিক যদি খুঁজে পায় কোনোদিন সে পড়ে নেবে যখন আমি মাটিতে থাকব মিশে।

প্রিয় মাহদি, আমি ভেবেছি, আমাকে তুমি এই চিঠি লিখেছ—

পৃথিবী যখন শান্ত হয়ে গিয়েছিল বলে তুমি অনুভব করেছ, তোমার কাঁধে কেউ হাত রাখেনি সে আমি দেখেছি। তোমার এমন বিপর্যস্ত দিনের কোনো সঙ্গী

নেই। তোমাকে মনে করার কেউও নেই হয়তো। কিন্তু আমি দেখো, দিব্যি রাতকে দিন করেই চিঠি লিখতে বসেছি।

ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাচ্ছে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউই বলতে পারেন না। তোমার ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকার হয় কি না ভাবতেই ভয় পাচ্ছি!

এখন তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নও দেখতে পারো না। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছ মন থেকে। প্রিয় শুভদিনগুলোর আলোছায়া কিচ্ছু নেই আর তোমার জীবনের ওপর। তুমি বোধহীন ও নিস্তরঙ্গ। এখন তুমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতে পারো না। সময়ই তো নেই।

মাহদি, তোমার কাছে আমি সান্ত্বনা পাই। তুমি লিখেছ—

পাওলো কোয়েলহোর দা অ্যালকেমিস্টের সেই রাখাল বালকের মতো হতে পারবে না তুমি। কিংবা পারবে কি? তোমার আসল শান্তি ঠিক ওখানেই।

তোমার সামনে আলোর ইশারা ছিল, তুমি দুচোখ নামিয়ে নিয়েছিলে। সেই ইশারা তুমি হারিয়েছ। তোমার সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা ছিল, তুমি এখন ধূসর মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ। পিপাসায় তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই তো করার নেই। তোমার সামনে নেই নদী, নেই ঝরনা কিংবা মাথার ওপর আকাশে মেঘ, শুধু পিপাসা। আজ বন্ধুরাও হাত বাড়ায় না, তোমার পৃথিবীর উলটো পিঠে তোমাকে নামিয়ে দিতে। সবাই যখন ভুলে যেতে পেরেছে, মাহদি, তুমি পেছনের সবকিছু ভুলে যাও।

সেই আনন্দের দিনে, তোমার সঙ্গে আনন্দ করার, হাসিখুশি, কথা বলার মানুষের কোনো অভাব ছিল না। তাদের কেউই তোমার চারপাশে আজ নেই।

নিজেকে নতুন করে ভাবতে শেখো। তুমি যখন জীবনে সফল হওয়ার জন্য এতই ছটফট করছ, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, চূড়ান্ত সময়ে চূড়ান্ত অনুগ্রহ করবেন বলেই। তুমি ভুলে যেয়ো না যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমাকে ভালো না বেসে সৃষ্টি করেননি।

আলোর ইশারা হারিয়েছিলে, সে তো খুঁজে পেতে সমস্যা নেই। সবসময়ই তোমার স্বপ্ন-আকাশে একটি আলোকরেখা খুঁজে পাবেই। দেখে নিয়ো। যারা আজ তোমাকে চেয়েছিল, তাদের সবাই বেঁচে আছে। তোমাকে ভুলে বসা সবাই তোমার মনের ভেতর ঠিকই জায়গা করে নিয়েছে। বিদায় করে দাও বিষাদের উপকরণ। হৃদয়ের যন্ত্রণা কমিয়ে নাও। যারা ছিল, আজ নেই, ভুলে যাও।

—সূচি—

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাইল্ড-প্রডিজি	১১
চাইল্ড-প্রডিজি টু ইয়ং মাহদি	৩২
কিশোর কিডন্যাপ	৭২
পর্বত পাদদেশে	৯৪
পাইওনিয়ার এস্টেট	১০৬
আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর	১২৩
ট্রায়াঙ্গল পেরিয়ে	১৩৩
ফ্লেউর ডে লিস	১৫০
মহাকাশ মহাকাল	২০৫
অন্য পৃথিবী	২২০

চাইল্ড-প্রডিজি

সবাই মাহদির কথা বলে, সে ভালো ও ভদ্র ছেলে। তাকে সবাই ভালোবাসে, আদর করে।

বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুল ছুটি হয়েছে। সবাই যার যার বাড়ি গেছে বৃষ্টিতে ভিজেই। কিন্তু মাহদি যায়নি।

স্কুলের স্যার-ম্যামরাও রয়ে গেছেন। কেউ কেউ ছাতা নিয়ে এসেছেন, তবু রয়ে গেছেন। মাহদি তাও নিয়ে আসেনি।

বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। 'ঢল' হচ্ছে। মাঠের ঘাসে বৃষ্টি পড়া সুন্দর দেখাচ্ছে। হালকা ছিটে লাগছে মাহদির গায়ে। সে বারান্দায় বসে আছে।

স্যার-ম্যামদের কথা ভেসে আসছে মাহদির কানে। বৃষ্টি পড়ার আওয়াজকে ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে। মাহদি তার আম্মুর কথা ভাবল। তিনি কী করছেন এখন? একটি ছাতা নিয়ে যদি আসতেন মাহদিকে এগিয়ে নিতে! হয়তো তিনি কিছুতে ব্যস্ত। তবু এই বৃষ্টির সময়? যাহ, মাহদিকে ভুলেই বসেছেন!

'একটু তো ঘড়ির দিকে তাকাও আম্মু! আমার স্কুল তো সেই কখন ছুটি হয়েছে!' মাহদি মনে মনে আকুতি জানাল। তাকে কতক্ষণ এভাবে একা বৃষ্টি পড়া দেখতে হবে!

স্কুল থেকে কাছেই মাহদিদের বাড়ি। তার মতো দৌড়বিদের তিন মিনিটের পথ—এরচেয়েও বেশি সময় অন্য কারও লাগলে লাগবে।

কমনরুম থেকে বের হয়ে এক ম্যাম বৃষ্টির পানিতে হাত ভেজালেন। তখন দেখতে পেলেন ছোট্ট মাহদিকে। বইখাতা-কোলে বসে আছে। ম্যাম এগিয়ে এলেন মাহদির দিকে। ম্যামকে আসতে দেখে মাহদি উঠে দাঁড়াল। ম্যাম ডান হাতের চার আঙুলে মাহদির চুলে সিঁথি কেটে দিয়ে বললেন, 'একা একা বসে আছ! বৃষ্টিতে ভিজতে মানা বুঝি?'

'ভেজা বই নিয়ে বাড়ি গেলে আমাকে আম্মু পিটুনি দেবেন!'

'অ্যাই, দেখো ছোট্ট মাহদিকে!' নাহিদ স্যারকে রুম থেকে বেরোতে দেখে ম্যাম হাসতে হাসতে বললেন।

‘কী করে?’

‘দার্শনিক চিন্তাভাবনা। বই বৃষ্টিতে ভেজাবেন না বলে উনি বাড়ি যাচ্ছেন না আজ।’

‘ওহ, তাই নাকি!’

‘এসো মাহদি।’ ম্যাম ডাকলেন।

মাহদির হাত ধরে ম্যাম তাকে কমনরুমে নিয়ে গেলেন। রুমের মাঝখানে যে টেবিলটা রয়েছে, তার ওপাশে হেডস্যার বসে ছিলেন। মাহদিকে রুমে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বলে উঠলেন, ‘মাহদি যে!’

হেড স্যারের সামনে টেবিলে একটি গ্লোব ছিল। তাই দেখে মাহদির চোখের তারা নেচে উঠল। গ্লোবটা নতুন কিনে আনা হয়েছে। এর আগে মাহদি যতবার এ রুমে এসেছে, দেখতে পায়নি এটা।

এই কয়েকদিন আগেই আম্মুকে মাহদি একটি গ্লোব কিনে দিতে বলেছে। মাহদি মনে করে পৃথিবী নিয়ে ভাবতে হলে প্রথমেই একটি গ্লোবের প্রয়োজন। এটি ভাবতে সাহায্য করবে। মাহদির আম্মু মোবাইলে তার আব্বুকে জানিয়েছেন। ঢাকায় থাকেন তিনি।

চকিতে একটি প্রশ্ন খেলে গেল মাহদির মগজে। প্রশ্নটা করতে ছাড়ল না সে। টেবিলের দুপাশের চেয়ারগুলোতে স্যার-ম্যামরা বসে আছেন। ডানপাশের চেয়ারগুলোর পেছনের ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাহদি এগিয়ে গেল হেড স্যারের দিকে। হেড স্যারের কাছাকাছি একটি চেয়ারে মাহদি বসল। টেবিলের ওপাশের চেয়ারে বসে থাকা একজন ম্যাম একটি প্লেট এগিয়ে দিলেন এদিকে। আপেলে ভরা প্লেটটি। নাহিদ স্যার একটি আপেল তুলে দিলেন মাহদির হাতে। আপেলটার দিকে একনজর দেখে খানিকটা সময় তার সামনেই গ্লোবের দিকে তাকিয়ে থেকে মাহদি বলল, ‘কমলালেবু আর আপেলের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য নেই। আপেল আর গ্লোবটারও কী সামঞ্জস্য। আর গ্লোব হলো আমাদের জলগ্রহ এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদে প্রতিকৃতি। কিন্তু আমার কথা সেটা নয়,’ এইটুকু বলে আপেলটায় একটা কামড় বসাল মাহদি। ভালো অভিনয় করতে পারে সে। বলল, ‘আমার কথা হচ্ছে, কোনো গোলাকার বস্তুর ভারসাম্য বলতে আমরা কী বুঝি?’ খাঁটি বিজ্ঞ মানুষের ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করে আপেলটায় আর-এক কামড় বসাল মাহদি।

মাহদিদের পাশের চেয়ারে বসা প্রীতি ম্যাম 'আউফ' করে উঠলেন। সকলের চোখ তার দিকে ঘুরে গেল। পরমুহূর্তেই হেসে উঠলেন সবাই। শুধু মাহদি তার ভ্রু কুঁচকে ফেলল আর হেড স্যার চুকচুক করে একটা শব্দ করলেন। মাহদির মনে পড়ল তার আম্মু তাকে বলেছিল, একজন নবী ছিলেন যার নাম ছিল ইউসুফ। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তিনি অনেক সুন্দর ছিলেন। তখনকার মিশরের যিনি রাজা ছিলেন, তার একজন রানি ছিলেন, নাম জুলাইখা। তিনি তার সখীদের কাছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেন। সখীরা গোঁ ধরল ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখবে বলে। একদিন রাজমহলে সব সখীকে জড়ো করে তাদেরকে জুলাইখা দুইপাশে সারি দিয়ে বসিয়ে সবার হাতে একটি করে আপেল, আর একটি করে চাকু দিলেন আপেলটি কাটার জন্য। বলে দিলেন, যখন তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে এই মহলে প্রবেশ করবেন, তখন যেন সবাই যার যার আপেল চাকু দিয়ে কেটে ফেলে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে যখন জুলাইখা মহলে প্রবেশ করে সবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন, সখীরা আপেল কাটতে শুরু করল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মহলের অপর পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরপরই সবাই খেয়াল করল, আপেল না কেটে সবাই কেটেছে তাদের আঙুল! হেসে ফেলল মাহদি। তার হাসির কারণে আরেক দফা স্যার-ম্যামরাও হেসে নিলেন। মাহদির কথায় মনোযোগ দিতে গিয়ে চাকু দিয়ে আপেল না কেটে আঙুল কেটে ফেললেন কি না ম্যাম, তিনি আঙুল চুষছেন এখন।

'আমি বুঝেছি মাহদি কেন একটু পরে হেসেছে,' মাহদির মুখের দিকে তাকিয়ে হেড স্যার বললেন, 'আচ্ছা ছোট্ট মাহদি, তুমি কি বলতে পারবে ইউসুফ নবী জুলাইখার প্রেমিক ছিলেন কি না?'

সবকিছু নিয়েই কথা বলতে পারে বলে, সবাই ছোট্ট মাহদিকে যা-তা-ই জিজ্ঞেস করে। আর হেড স্যার এমনিই একেবারে খোলামেলা মনের মানুষ। তিনি তো কথা লুকান না। থাকেন গম্ভীরভাবে। কিন্তু প্রায়ই আপনমনে কথা বলে ওঠেন। তার মাইন্ড রিডিংয়ে এক বিশেষত্ব আছে।

সব স্যার-ম্যাম নড়েচড়ে নিলেন। জানেন সবাই উত্তর দেবেই মাহদি।

'জি স্যার, আমি পারব। আম্মু আমাকে বলেছিলেন, জুলাইখার ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি গভীর আসক্তি ছিল, সত্য, তবে এই বিবাহিতা মহিলার প্রতি আগ্রহী হওয়ার জন্য ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোনো কারণ

ছিল না। জুলাইখার চেয়ে কত ভালো নারীরাই তো তখন ছিলেন—অবিবাহিত কুমারী নারীগণ। ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান গভীর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নবী একজন রাজপত্নীর প্রেমে পড়বেন এমন তো ভাবাও খুব বোকামি।'

'এই মাহদি,' প্রীতি ম্যাম ডাকলেন, 'তুমি কুমারী কাকে বলে, বোঝ?'

'জি, অবশ্যই। অভিধানে কুমার হলো অবিবাহিত পুরুষ। সুতরাং কুমারী, অবিবাহিত নারী।'

একটু থেমে আবার মাহদি বলতে লাগল, 'ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যেমন, কিছু দুষ্ট মানুষ আছে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রকেও খাটো করতে চায়। নবিজির আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করায় তারা দোষ পেয়ে ওঠে। আরও তাঁর একাধিক বিয়ের জন্য যা-তা বলে। তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী থেকে আমরা জানি, প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় পৃথিবী থেকে বিদায় না নিতেন, তাহলে যেন তিনি দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করতেনই না। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো, তিনি চাইলেন, তাই খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে পৃথিবী থেকে তুলে নিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করলেন বিয়ে করার। তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে আল্লাহর আদেশেই তিনি বিয়ে করলেন একে-একে কয়েকজন নারী—তারা উম্মাহাতুল মুমিনিন।

'বিধবা নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে নেওয়াটা মুসলমানদের কাছে যেন কঠিন না হয়ে যায়, যেন তিনি কয়েকজন বিধবা বিয়ে করেছেন, তাতে সাহাবা কেরামের অনুৎসাহ দূর হয় বিধবাবিবাহের। পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে যেন মুসলিম সমাজে স্বাভাবিক হতে পারে—সকলই আল্লাহর নির্দেশেই—তেমনই এক বাদশাহর পাঠানো নারী-উপহারকে তিনি বিয়ে করে নেন, তাও কী উত্তম আদর্শের নমুনা, আল্লাহর নির্দেশেই। কমবয়সি কোনো মেয়েকে বিয়ে করা যে মন্দ নয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য, আল্লাহর নির্দেশেই তিনি এমনটি বুঝিয়েছেন। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়। আর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দিয়েছিলেন দুনিয়ার অতীত-ভবিষ্যৎ এবং তাঁর সমসময়ের, সব মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা। রাসুলের সঙ্গে যদি অল্পবয়সি প্রখর মেধাবিনী আয়িশা

রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে না হতো, সেই তিন সহস্রাধিক হাদিস কীভাবে আমাদের জানা হতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যা বর্ণনা করতে পেরেছিলেন?

'শিক্ষার্থী হিসাবে শুধু আমাকে দিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন পূর্ণতা পাবে না, ছাত্র হিসাবে শুধু আমাকে শিখিয়েই যেমন জ্ঞানকে ব্যাপক করা যাবে না, তেমন এক নারীশিক্ষা বিদ্যালয়ে একজন বালিকার শেখাপড়ায় কী লাভ আর হবে সব নারীর, কতটুকু জ্ঞানই-বা প্রসার পাবে। সেজন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশপ্রাপ্ত হন একাধিক বিয়ের, যাকে বলে বহুবিবাহ। অন্তত পক্ষে কোনো এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীর অধিকার সমানভাবে প্রদান করতে পারবে, সেই প্রমাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছিলেন।'

বাইরে বৃষ্টি পড়া আরও বেড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকানো ঘন হলো। মেঘে আর মেঘে ঘর্ষণের টানা গুড়ুমগুড়ুম হয়েই চলল। কোথাও কোথাও বজ্রপাতও হতে থাকল, কানে লাগতে লাগল তালা।

২.

চুপচাপ কয়েকটা আপেল খেল মাহদি। বাইরের আওয়াজ যখন বেশ কিছুটা কমে এলো, তখন উঠল সেই আগের প্রসঙ্গ। 'পৃথিবীর গোলাকার তত্ত্বের সঙ্গে আমার প্রশ্ন "কোনো গোলাকার বস্তুর ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?" এর সম্পর্ক রয়েছে। মহান আল্লাহ পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর ভারসাম্যের জন্যও। আমাদের ভাবনার বিষয় হয় যে, কোনো গোলাকার জিনিসের ভারসাম্য আসলে কী? স্যার, ভারসাম্য কাকে বলে?' হেড স্যারের দিকে তাকাল মাহদি।

স্কুলে মাহদি সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে এই বছর। এই তো মাসতিনেক আগে। কিন্তু স্কুলের স্যার-ম্যামগণ দেখছেন স্কুলে মাহদিকে পড়ানোর মতো আসলে নেই কিছু। বিজ্ঞানের ভাষায় মাহদি একজন চাইল্ড জিনিয়াস বা প্রডিজি বা চাইল্ড-প্রডিজি। তাকে শিক্ষকগণ ওপরের ক্লাসে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, একেবারে পঞ্চম শ্রেণিতে। কিন্তু তার আম্মু বলেছেন, 'নাহ, তারচেয়ে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আরও যা-কিছু পড়ানো-শেখানো আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়, অনুরোধ করি তাকে শেখান। এখন ওপরের ক্লাসে তুলে দিলে

বয়সে বড়দের অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়তে হবে।' ভর্তি হওয়ার পর থেকেই ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে, পাঠ্যবই ও পাঠ্যবইয়ের বাইরে নানারকম প্রশ্ন সে করে আসছে, বিশেষ করে যখনই হেড স্যারকে সামনে পেয়েছে। যা-হোক।

'এখানে, এই যে এই টেবিলটার ভারসাম্য বলতে আমরা বুঝি, ছয়টি পায়ার ওপর এটি বসে আছে। বসে আছে কি দাঁড়িয়ে আছে সে প্রশ্নে না যাই, স্থির আছে। কাত হয়ে যাচ্ছে না। টেবিলটির ভারসাম্যহীনতা বলতে আমরা বুঝব এর কাত হয়ে পড়ে যাওয়া। এই যে গ্লাসটি,' হেড স্যার টেবিল থেকে একটি কাচের গ্লাস হাতে নিয়ে আবার ঠক করে রেখে দিলেন, 'স্থির হয়ে বসে গেল, বসে যেতে পারল, সে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে। সোজা জায়গায় সোজা করে বসালেই বসে, ভারসাম্যের সক্ষমতা আছে বলে। সেভেন-আপের প্লাস্টিকের একটি বোতল, ধরো, তলার দুটো উঁচু অংশ কোনো আঘাতে দেবে গেল, আর বোতলটি দাঁড় করিয়ে রাখতে যেতেই বারবার পড়ে যেতে লাগল, এই হলো বোতলের ভারসাম্যহীনতা। অর্থাৎ বোতলটির ভারসাম্যের মানে ছিল সেটির স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারা। আমরা বসে থাকি, দাঁড়িয়ে থাকি, চলি-ফিরি তা নিজেদের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি বলেই। আমরা সবাই একসময় দাঁড়াতে পারতাম না, হাঁটতে, দৌড়াতে পারতাম না। ধীরে ধীরে ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখেছি। সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে এদিক-ওদিক বারবার পড়ে গেছি। এখন দুই চাকার সাইকেলে চড়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে পারি। মানে ইচ্ছে হলে হয়তো পারব। আমরা শিখেছি সাইকেলের ভারসাম্য রক্ষা করতে...'

'তারমানে ব্যালেন্স অব পাওয়ার।' মাহদি হেসে বলল, 'আমরা এটাকেই ভারসাম্য বলি। যার যে কাজ তার অন্যথা হয় ভারসাম্যহীনতার ফলে। ভারসাম্য নয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। দৌড়াতে গিয়ে আপনাতেই উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়া, এটা অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনই ভারসাম্য বজায় রাখতে না পারার ফল। আমাদের দ্বারা ভারসাম্য বজায় রাখার মানে হলো, হাঁটতে গিয়ে অযথাই কাত হয়ে পড়ে না যাওয়া। একটি গ্লাসের ঠিকভাবে বসে থাকা তার ভারসাম্য বজায় রাখা, তো এর বিপরীত তার ভারসাম্যহীনতা। একটি শিশু হাঁটতে গিয়ে পড়ে যায় আবার উঠে দাঁড়ায়, পড়ে যায় আবার দাঁড়ায়, হাঁটতে চেষ্টা করে। পড়ে যাওয়া তার ভারসাম্য রক্ষা নয়, দাঁড়াতে পারার মানেই ভারসাম্য রক্ষা করতে একটু সক্ষম হওয়া। অতএব একটি দিক ভারসাম্যহীতার, আর একটি দিক ভারসাম্যের। দুইটি দিকই বিপরীত। একদম একমুখী না। পড়ে যাওয়াকেই ভারসাম্য বলব না, দাঁড়াতে পারাকে ভারসাম্যহীনতা বলব না। কিন্তু একটি বল, অথবা মার্বেল, এর গুণ কি